POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ
عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○ (النساء:133، 134)

এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। হে মানবমণ্ডলী! যদি তিনি চাহেন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) অন্যদেরকে লইয়া আসিতে পারেন এবং আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৩-১৩৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 51
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

17 ডিসেম্বর, 2020 ● 1 জামাদিউল আওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি খুতবা চলাকালীন মসজিদে আসে, সে যেন দুই অনতিদীর্ঘ রাকাত নামায পড়ে নেয়।

৯৩১) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি জুমার দিন (মসজিদে) এল, যখন নবী (সা.) খুতবা প্রদান করছিলেন। তিনি বললেন: তুমি কি নামায পড়েছ? সেই ব্যক্তি উত্তর দিল, 'না'। তিনি (সা.) বললেন, উঠে দুই রাকাত নামায পড়ে নাও।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- " খুতবা চলাকালীন নফল নামায পড়া ইমাম মালিক (রহ.) এর নিকট বৈধ নয়। বরং নফল নামায পড়ার থেকে খুতবা শোনার আদেশটি অগ্রাধিকার পায়।

তিনি (রা.) বলেন, মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কিত এই নফল এমনটিই হয় যার উপর খুতবা শোনা প্রাধান্য পায়, তবে আঁ হযরত (সা.) খুতবার মাঝে হযরত সুলাইক গাতফানি (রা.) কে একথা কেন বললেন যে, দুই রাকাত নফল পড়ে নাও? আঁ হযরত (সা.)এর এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে, দুটি নির্দেশই নিজ নিজ ক্ষেত্রে পালনীয়। উভয়ের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। খুতবা চলাকালীন আগমণকারী ব্যক্তি সেই সময় শ্রোতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যখন সে প্রথমে মসজিদের তাহিয়া নামায পড়ার নির্দেশ পালন করে ফেলবে।
(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল জুমআ)

এই সংখ্যায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৩ নভেম্বর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

কেবল ডাক্তার কিম্বা চিকিৎসার উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। খোদা তা'লার অভিপ্রায়, পরকালের উপরও যেন মানুষের ঈমান তৈরী হয়।

নির্বোধ মানুষ যখন ভয়ানক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়, তখনই সে খোদাকে স্মরণ করে। কিন্তু পরীক্ষা হিসেবে তাকে যখন এমনিই অব্যহতি দেওয়া হয়। তখন সে এমন এক নীতি অবলম্বন করে, তার চালচলন এমন হয়ে ওঠে যেন তাকে আর মরতেই হবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তওবা এবং ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব

সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তওবা এবং ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব। এমনকি কোনও ব্যক্তির জন্য দোযখের লিখন যদি অবধারিত হয়ে যায়, তবে সেই সিদ্ধান্তও এড়ানো যায়। মানুষ যদি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, মনোযোগ দেয় তবে আল্লাহ্ তা'লা চাইলে সেই ভূ-খণ্ড তথা দেশকে নিরাপদ রাখবেন। তিনি যা চান করেন। কিন্তু এও বলেছেন যে قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ (আল ফুরকান:৭৮) তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি তাঁর বান্দেগী না কর, তবে তিনি পরোয়া করেন না। এই সব লোকেরাই বলে, অলিতে গলিতে ডাক্তার ও হাকীম রয়েছে, হাসপাতাল খোলা আছে প্রয়োজনে সেখানে দ্রুত চিকিৎসা করিয়ে নিব। কিন্তু তারা জানে না যে মুম্বাই এবং করাচীতে কত সব খ্যাতনামা ডাক্তার এই রোগের সংস্পর্শে এসে মারা গেল! যারা এর সেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, তারা নিজেরাই এর শিকার হল। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তিমত্তা এবং আধিপত্য প্রদর্শন করে আমাদের জানিয়ে দেন যে, কেবল ডাক্তার কিম্বা চিকিৎসার উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। খোদা তা'লার অভিপ্রায়, পরকালের উপরও যেন মানুষের ঈমান তৈরী হয়। দেখা যাক মানুষ খোদার ইচ্ছার প্রতি কতটা সম্মান প্রদর্শন করে! যেভাবে মানুষ কয়েক ইঞ্চি জমির জন্য বিবাদে লিপ্ত হয়, ষড়যন্ত্র করে, মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলা সহন করে, সেভাবে খোদার কোনও আদেশ পালন না করতে পারার কারণেও কি তার মনে এমন ব্যকুলতা ও বেদনা সৃষ্টি হয়েছে? কখনই নয়।নির্বোধ মানুষ যখন ভয়ানক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়, তখনই সে খোদাকে স্মরণ করে। কিন্তু পরীক্ষা হিসেবে তাকে যখন এমনিই অব্যহতি দেওয়া হয়। তখন সে এমন এক নীতি অবলম্বন করে, তার চালচলন এমন হয়ে ওঠে যেন তাকে আর মরতেই হবে না। সাধারণ ব্যধিতে মারা গেলেও মানুষের অন্তরে কিছুটা প্রভাব পড়ে। দুই তিন পর্যন্ত নামমাত্র আবেগের প্রভাব তাদের হৃদয়ে বজায় থাকে। অতঃপর তারা নিজেদের হাসি-তামাশা, গল্পগুজবে ফিরে যায়। তারা গোরস্থানে গিয়ে মৃতদের সমাধিস্থ করে আসে, কিন্তু এক মুহূর্তের তরেও দাঁড়িয়ে চিন্তা করে না যে একদিন তাদেরকেও খোদার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। খোদা দেখলেন, সাধারণ মৃত্যু মানুষকে আর সেভাবে নাড়া দেয় না.... তাই তিনি অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন এবং প্লেগের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করতে চাইলেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৩-২৩৪)

কুরআন করীমের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে জিহাদ কর যা সব থেকে বড় জিহাদ।

جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا- এর তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি এই কাফেরদের কথা শুনবে না। কুরআন করীমের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে জিহাদ কর যা সব থেকে বড় জিহাদ। অর্থাৎ তবলীগের জিহাদ, যার কাছে যেতেও এ যুগের মুসলমানদের দম বন্ধ হয়ে আসে। তারা এই জিহাদ থেকে এই ছুতো দেখিয়ে পালায় যে সশস্ত্র জিহাদই হল প্রকৃত জিহাদ। আর সশস্ত্র জিহাদ থেকে এজন্য পালিয়ে বেড়ায় যে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী। মৌলবী ফতোয়া দিয়ে বলে, এগিয়ে চল! যুদ্ধ কর! আর মুসলমানেরা বলে, হে উলেমাগণ! আপনারা এগিয়ে চলুন এবং যুদ্ধ করুন। কেননা আপনারা আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক। এরপর তারা উভয়ে নিজের নিজের বাড়ির দিকে প্রস্থান করে। অথচ খোদা তা'লা আমাদের হাতে সেই অস্ত্র দিয়েছেন যাতে কখন মরিচা ধরবে না, যা কোন যুদ্ধে ভেঙ্গে যাবে না। তেরোশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, পৃথিবীর দুর্ধর্ষ জাতিগুলি এটিকে অস্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছে, খণ্ডবিখণ্ডিত করে দিতে চেয়েছে এবং চিরকালের জন্য অকেজো করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু এই তরবারি ভাঙ্গে নি। এটি সেই কুরআন যা খোদা আমাদেরকে দিয়েছেন এবং এটি সেই অস্ত্র যার দ্বারা আমরা পৃথিবী জয় করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

(শেষাংশ শেষের পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

হুযুর আনোয়ার-এর সঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্রীদের সাক্ষাত অনুষ্ঠান

Discussion of Head Scarf from the pedgogical point of view.

অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্দা সংক্রান্ত আলোচনা।

বিগত দশ বছরেরও অধিককাল থেকে জার্মানীতে সেই সব মহিলাদের মাথা ঢেকে রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, যারা পাবলিক সার্ভিস অর্থাৎ শিক্ষা এবং উকিল পেশার মত কাজের সঙ্গে যুক্ত। এর কারণ ছিল ইসলাম বিরোধী রাজনীতিকদের বিবৃতিসমূহ। এছাড়াও তর্কসভা চলাকালীন সকল পক্ষের কথা শোনা হত না আর ইসলামের বিরুদ্ধে একপেশে আন্দোলন অব্যাহত থেকেছে। এরপর ক্রমশ এই বিতর্কের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে জার্মানীর আদালত শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য সকল মুসলমানদের জন্য পর্দার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়। অনেক উদারবাদী রাজনীতিক এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং এটিকে গণতন্ত্র তথা সাম্যবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আখ্যা দেয়।

হুযুর আনোয়ার সেই ছাত্রীকে বলেন, আপনি এত দ্রুত পাঠ করলেন, জানি না কেউ কিছু বুঝতে পেরেছে কি না!

এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, আমাদেরকে কোন বিষয়ের উপর গবেষণাপত্র লেখা উচিত, যেগুলিতে ইউরোপীয় সমাজের নেতিবাচক দিকগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রকৃত বিষয় হল নৈতিকতা। এর পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বিয়ে না করেও একে অপরের সম্মতিক্রমে সম্পর্ক স্থাপন করাকে ইউরোপে নীতিগতভাবে সঠিক মনে করা হয়, এর জন্য কোনও শাস্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি জোর করে সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে শাস্তি নির্ধারিত আছে। ইসলাম বলে, নৈতিকতা সম্পর্কিত তোমাদের এই পরিভাষা ত্রুটিযুক্ত তথা অন্যায্য। প্রত্যেক জিনিসের একটি নিয়ম আছে, বিয়ে করলে জীবনে স্থিরতা আসবে। বিবাহ করার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন কর। বংশবৃদ্ধি কর। এছাড়াও এই একইভাবে পার্লামেন্ট সমকামিতার বিষয়ে আইন পাস করে দেয়, অথচ ইসলাম এবং বাইবেলও দাবি করে যে এটি অনুচিত। কুরআন করীমে লেখা আছে, এই কারণে একটি জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। এই ধরণের বিষয় আপনারা খুঁজে বের করতে পারেন। আপনাদের মস্তিষ্ক এখন অনেক উর্বর। বাকি রইল পর্দা প্রসঙ্গ। এখনই এখানে বলা হয়েছে যে, মুসলমান মহিলারা বলে, ধর্মের অনুসরণে তারা পর্দা ব্যবহার করবে? ইসলাম একথা বলে না যে চোখ বন্ধ করে আনুগত্য কর। কেবল একটি বিষয়ের উপর চোখ বন্ধ করে ঈমান আনতে হবে আর সেটি হল আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান আনা এবং অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা। আর এর কারণ, ধীরে ধীরে যখন ঈমান সমৃদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের মাঝে নিজের জ্যোতির্বিকাশ ঘটাবেন। পর্দার যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা নিজেদের পরিচয় প্রকাশের জন্য। এই কারণে ভদ্রলোকেরা পর্দা দেখে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। ইসলাম কেবল একথাই বলে নি যে নিজেদের মাথা আবৃত রাখ, বরং এর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, যাতে তোমরা অপরের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাও। সেই অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে একটি অন্তরায় রাখা উচিত।

এক ছাত্রী নিবেদন করে, 'কিছু মহিলা, যারা শিক্ষক হচ্ছিলেন, তারা এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে লোকেরা বলে, আমার ধর্ম আমাকে ত্যাগ স্বীকার করার নির্দেশ দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি বল তোমরা ত্যাগ স্বীকার করছ, তখন তারা বলবে, 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের থেকে ত্যাগ দাবি করে, পুরুষদের কাছে কেন দাবি করে না? অনেকে তোমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। তোমরা তাদেরকে এর উপকারিতা সম্পর্কে বোঝাও। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে যেখানে পর্দার আদেশ দিয়েছেন, তার পূর্বে তিনি পুরুষদেরকে বলেছেন, তোমরা নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখ। অনেক ইউরোপীয়ান মহিলা, যারা আমাদের জলসায় আসেন, যেমন যুক্তরাজ্যের জলসায় একজন সাংবাদিক এসেছিলেন। তিনি সারা দিন মহিলাদের মার্কিতে কাটিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি বলতেন, এই বিভেদ কেন? এরপর সারা দিন কাটানোর পর সন্ধ্যায় তিনি বলেন, আমি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা উপভোগ করেছি। আমি জানতে পেরেছি যে পুরুষদের দৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত আছি, যারা কামলোলুপ দৃষ্টি দেয়। আমি পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলাম। এখানে কেবল মেয়েরাই কাজ করছিল। মহিলাদের একটি মূল্য আছে যা একমাত্র ইসলামই বর্ণনা করে।

ছাত্রীটি নিবেদন করে,'এই সমাজের দাবি তুমি সারা দিন বাড়িতে যা খুশি পরিধান কর, কিন্তু স্কুলে মাথা ঢেকে এসে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, স্কুলের যে ইউনিফর্ম আছে, তা পরিধান কর, কিন্তু তাদেরকে বল, আমার মাথায় পর্দা রাখার অভ্যাস আছে। অনেক ইউরোপীয়ান পৌঢ়ার মাথা এখনও পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। শীতকালে পর্দা ছাড়া গলায় মাফলারও ঝোলানো থাকে।যেমন তুমি একটি গবেষণা করছ, এরজন্য তোমাকে এক বিশেষ ধরণের টুপি পরতে হয়, সেটি পর, কিন্তু যখন সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে আস, তখন উপযুক্ত পোশাক হওয়া উচিত। আসল বিষয় হল লজ্জাশীলতা। মহিলাদের লজ্জাশীলতা অবলম্বন করা উচিত। যাতে তারা নিজেদের সম্মান ও আব্রু সুরক্ষিত রাখতে পারে। এখানে লজ্জাশীলতা নেই। এই কারণে শতকরা অনেক বেশি মহিলা এখানে বিবাহের পূর্বেই যৌনাচারে লিপ্ত হয়। আমরা কেবল ত্যাগ স্বীকারই করছি না। তবে তোমরা একথা বলতে পার যে, যেহেতু আমার ধর্ম আমাকে এমনটি করার আদেশ দেয়, এই জন্য আমি এর থেকে বিচ্যুত হওয়া বরদাস্ত করতে পারব না। কিন্তু এর জন্য 'ত্যাগস্বীকার' শব্দটি যথাযথ নয়। যদি তোমরা এই শব্দটি ব্যবহার কর, তবে লোকেরা তোমাদের উপর আপত্তি করবে।

এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, কুরআন করীমে পর্দা সংক্রান্ত একাধিক আয়াত আছে, আর এও বলা হয় যে, 'সামিয়ানা ও আতা'না' অর্থাৎ শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। এখানে লোকেরা বলে পর্দার আদেশটি আমি আগে বুঝব তার পর অনুশীলন করব। এমন মানুষদের কিভাবে বোঝানো উচিত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তাদের বলতে হবে যে অনুধাবন কর, কিন্তু বোঝার জন্য নিজেদের মাথা খালি কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, পুরুষদের ভরসা করো না, এটি ঠিক সেরকমই যেভাবে আমরা একটি কুকুরের সামনে রুটি ফেলে দিয়ে আশা করি যেন সে রুটিটি না খায়। তোমরা যদি পর্দাহীন হও, তবে এতে পুরুষদের উপর কিসের ভরসা? তিনি বলেছেন, তোমাদের দাবি, পর্দা থাকা উচিত নয়। তোমাদের কথাই মেনে নিলাম, কিন্তু তোমরা কি এর নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে, পুরুষরা কুদৃষ্টি দিবে না? তোমরা কি নিশ্চয়তা দিতে পার?

সেই ছাত্রী উত্তর দেয়, 'না।' হুযুর আনোয়ার বলেন, পর্দার দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি সাধারণত দেখেছি, মানুষ সেই সব মহিলাকে সম্মান করে যারা পর্দা করে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,'আল হায়াউ মিনাল ঈমান'। অর্থাৎ, লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ। আর নিজেদের সম্মানকে সুরক্ষিত রাখাই হল মহিলাদের লজ্জাশীলতা। তার উপর কোনও অভিযোগের আঙুল ওঠার পূর্বেই সে যেন নিজের সম্মান বজায় রাখে আর অকারণে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না গড়ে তোলে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় কিম্বা গবেষণার সময় ছেলেদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়, কিন্তু সেই পরিবেশে থেকেও নিজেদের সম্মান বজায় রেখে তাদের সঙ্গে কথা বলুন। কিন্তু সেই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলা কিম্বা গবেষণা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়। এই কারণেই ইসলাম বলে, তোমরা সম্মানের সঙ্গে কথা বল, যাতে পুরুষরা বুঝে যায় যে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কোনও অনুচিত কাজ করাতে পারবে না। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল নিজের ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহিলারা দুর্বল, অনেক সময় তারা পুরুষদের মিষ্টি কথায় ভুলে যায়। এই কারণেই তাদেরকে

(এরপর ১০ এর পাতায়..)

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এবং হযরত সিমাক বিন খারাশা (আবু দুজানা) রাজিআল্লাহু তা'লা আনহুমার পবিত্র জীবনালেখ্য।

চারজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব, যারা হলেন- মাননীয় মাহবুব খান সাহেব শহীদ (পেশাওয়ার, পাকিস্তান), ফখর আহমদ ফরখ সাহেব (মুরুব্বী সিলসিলা, পাকিস্তান), তাঁর পুত্র এহতেশাম আহমদ আব্দুল্লাহ্ এবং ডাক্তার আব্দুল করীম সাহেব (সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১৩ নভেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৩ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আজ বদরী সাহাবার স্মৃতিচারণ করা হবে। তবে সর্বপ্রথম আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। দুই খুতবা পূর্বে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) সংক্রান্ত আলোচনায় মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের একটি রেওয়ায়েত ছিল যাতে প্লেগের কথা বলা হয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, অচিরেই তোমরা সিরিয়ায় হিজরত করবে আর তা তোমাদের হাতে বিজিত হবে। কিন্তু সেখানে ফোঁড়া ও ফুসকুড়ির এক মহামারী তোমাদের আক্রান্ত করবে যা মানুষকে সিঁড়ির পায়ে ধৃত করবে। এবাক্যের সঠিক অনুবাদ তুলে ধরা সম্ভব হয় নি, ভুল ছিল এবং এতে (অর্থাৎ যে অনুবাদ করা হয়েছে তাতে) বিষয় পরিষ্কারও হয় না। কাজেই এ সম্পর্কেরেওয়ায়েতটি সঠিক অনুবাদসহ বলে দিচ্ছি-

ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ্ -এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা সিরিয়ার দিকে হিজরত করবে। আর সিরিয়া তোমাদের জন্য জয় করা হবে। সেখানে তোমাদের মাঝে এক ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে যা ফোঁড়া এবং ব্যাপক দংশনকারী জিনিসের মত হবে আর তা মানুষের নাভির নিম্নাংশে দেখা দিবে। 'সিড়ির পাঁয়ে ধরবে'- এটি বিভিন্ন শব্দের ভুল অনুবাদ ছিল-যা পূর্বে করা হয়েছিল। সঠিক অনুবাদ হলো সেটি মানুষের নাভির নিম্নাংশে দেখা দিবে, যেভাবে নাভির নিম্নাংশে ও পায়ের ওপরের দিকে অর্থাৎ দেহের মধ্যবতী অংশে ফোঁড়া বের হয়। তিনি (সা.) বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শাহাদাত দান করবেন এবং এর দ্বারা তাদের আমল বা কর্মগুলোকে পবিত্র করবেন।এরপর হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান যে,মুআয বিন জাবাল একথা মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছে তাহলে তাকে এবং তার পরিবার পরিজনকে এ থেকে পর্যাপ্ত অংশ দান কর। এর ফলে তাদের সবার প্লেগ হয় আর তাদের একজনও রক্ষা পায় নি। তার তর্জনীতে প্লেগের ফোঁড়া বের হলে তিনি বলেন, এর পরিবর্তে যদি আমার লাল উটও লাভ হয়, আমি কখনো এতো খুশি হব না।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১)

অতএব এ ছিল অনুবাদের সংশোধনী। যে অনুবাদ প্রিন্ট হচ্ছে অর্থাৎ আল ফযলে যা ছাপা হয় তাতে পূর্বেই সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি ভাবলাম আপনাদের সামনেও বিষয়টি রেখে দিই।

(ধারাবাহিকভাবে) যে স্মৃতিচারণ চলছিল তা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-সংক্রান্ত। এখন সেই স্মৃতিচারণই পুনঃরায় শুরু হচ্ছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন অঙ্গাচ্ছেদ করা অবস্থায় আমার পিতাকে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আনা হয় অর্থাৎ তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছিল; বিশেষ করে কান ও নাক। তার মরদেহ মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে রাখা হয়। তিনি (রা.) বলেন, তখন আমি তার চেহারা থেকে কাপড় সরাতে গেলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করে। এরপর লোকেরা এক মহিলার চিৎকারধ্বনি শুনতে পায়; তখন কেউ একজন বলে, ইনি আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-এর কন্যা। তার নাম ছিল হযরত ফাতেমা বিনতে আমর (রা.)। অথবা এটিও বলা হয় যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-এর বোন ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কেঁদো না, কেননা ফেরেশতারা তাদের ডানা প্রসারিত করে তার ওপর নিরবচ্ছিন্নভাবে ছায়া করে রেখেছে।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫৪-৯৫৫)

অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন,ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন আমার পিতার মরদেহ নিয়ে আসা হয় তখন আমার ফুফু তার জন্য কাঁদতে থাকেন আর আমিও কান্না জুড়ে দিই। লোকেরা আমাকে বারণ করতে থাকে কিন্তু মহানবী (সা.) আমাকে নিষেধ করেন নি। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা তার জন্য ক্রন্দন কর বা না কর, আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাকে দাফন করেছ, ফেরেশতারা ডানা দিয়ে তার ওপর লাগাতার ছায়া করে রেখেছিল।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫৬)

ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, এ সম্পর্কে অনেক মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে একই কাফনে আবৃত করতেন আর জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন জানতো? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হতো তখন মহানবী (সা.) তাকে প্রথমে লেহদে রাখতেন বা কবরস্থ করতেন এবং বলতেন, আমি কিয়ামত দিবসে এসব লোকের পক্ষে সাক্ষী হব আর তাদেরকে রক্তমাখা অবস্থায়ই দাফন করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে গোসলও দেওয়া হয় নি আর তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয় নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩৪৩)

সহীহ্ বুখারীতে আরো একটি হাদীস রয়েছে। আমি যেটি পড়েছি সেটিও বুখারীর রেওয়ায়েত। দ্বিতীয় হাদীসে হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একদিন এসে ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন। বুখারীর অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, ওহুদের যুদ্ধের ৮ বছর পর মহানবী (সা.) শহীদদের জানাযার নামায পড়েছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩৪৪) (সহী বুখারী কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০৪২)

সুনান ইবনে মাজাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধের শহীদদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে আনা হলে তিনি (সা.) ১০ জন করে সাহাবীর জানাযা (একসাথে) পড়াতেন। হযরত হামযা (রা.)-এর মরদেহ তাঁর কাছেই থাকতো কিন্তু অন্য শহীদদের সরিয়ে নেওয়া হতো।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৫১৩)

সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদের শহীদদের গোসল দেওয়া হয় নি এবং তাদের রক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহসহ তাদের দাফন করা হয় আর তাদের কারোই

জানাযার নামায আদায় করা হয় নি।

(সুনান আবু দাউদ ,কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-৩১৩৫)

সুনান আবু দাউদেরই অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.) ছাড়া অন্য কোন শহীদের জানাযার নামায পড়েন নি।

(সুনান আবু দাউদ ,কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-৩১৩৭)

সুনান তিরমিযীর হাদীসে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন নি।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল জানায়েয, হাদীস-১০১৬)

'সীরাত ইবনে হিশাম'এবং 'সীরাত হালবিয়া'তে লেখা আছে, মহানবী (সা.) ওহুদের শহীদদের জানাযা যেভাবে পড়েছেন তা হলো, সর্ব প্রথম হযরত হামযা (রা.) জানাযা পড়ান। তিনি (সা.) জানাযার নামাযে সাত তকবীর দেন। 'সীরাত হালবিয়া' অনুসারে মহানবী (সা.) চার তকবীরে জানাযা পড়ান। এরপর অন্যান্য শহীদদের একে একে আনা হতো আর হযরত হামযা (রা.)-এর পবিত্র মরদেহের পাশে রাখা হতো এবং তিনি (সা.) উভয়ের জানাযার নামায পড়াতেন আর এভাবে সকল শহীদের জানাযার নামায একবার এবং হযরত হামজা (রা.)-এর জানাযার নামায ৭২ বার আর কারো কারো মতে ৯২ বার পড়া হয়।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৯৫-৩৯৬) (আস সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৭)

সীরাতগ্রন্থ 'দালায়েলুন্ নবুয়্যাত'-এ লেখা আছে, হযরত হামযা (রা.)-এর

মরদেহের পাশে ৯ জন শহীদকে একসাথে আনা হতো এবং তাদের জানাযার নামায পড়া হতো। এরপর এই ৯ জনকে সরিয়ে নেয়া হতো, তারপর অন্য ৯ জনকে আনা হতো; এভাবে সকল শহীদের জানাযার নামায আদায় করা হয়। জানাযার নামাযে প্রত্যেক বারই তিনি (সা.) ৭বার তকবীর দেন।

(দালায়েলুন্ নবুয়্যাত, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৮৭)

'সীরাতে হালবিয়া' ও 'দালায়েলে নবু য়্যায়' ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযার নামায সম্পর্কিত হাদীস নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে, মহানবী (সা.) ওহুদের যুদ্ধের শহীদদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে গোসলও দেওয়া হয় নি আর জানাযাও পড়া হয় নি- উভয় পুস্তকে এ রেওয়ায়েতকে অধিক দৃঢ় বা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮)(দালায়েলুন্ নবুয়্যাত, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৮৭-২৮৮) (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩৪৩)

হযরত ইমাম শাফী বলেন, মুতওয়াতের (অর্থাৎ এমন হাদীস যা বহুল সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন এবং রীতি বিচারে যাদের মিথ্যার উপর জোটবদ্ধ হওয়া অসম্ভব) রেওয়ায়েত থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মহানবী (স.) ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন নি। তিনি (সা.) সকল শহীদের জানাযা পড়েছিলেন এবং হযরত হামযার জন্য ৭০বার তকবীর বলেছিলেন- মর্মে যেসব রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, (তাদের) এ কথাটি সঠিক নয়। হযরত উকবা বিন আমের (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) ৮ বছর পর শহীদদের জানাযা পড়েছেন; এ রেওয়ায়েতে এটি উল্লেখ রয়েছে যে, এটি ৮ বছর পরের ঘটনা।

(ফতহুল বারী, শারাহ বুখারী, আল্লামা ইবনে হিজর আসকালানী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯)

যেমনটি আমি বলেছি এ সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে, এখানে আরো কিছু হাদীস তুলে ধরছি।

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

ইমাম বুখারী তাঁর পুস্তকে 'বাবুস্ সালাতে আলাশ্ শহীদে' অর্থাৎ হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন 'শহীদদের জানাযার নামায' এবং এর অধীনে শুধু দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের গোসলও দেওয়া হয় নি আর তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয় নি। পক্ষান্তরে অপর হাদীসে হযরত উকবা বিন আমের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ অর্থাৎ একদিন মহানবী (সা.) বের হলেন এবং ওহুদের শহীদদের জন্য জানাযার নামাযের আদলে নামায পড়লেন। এ হাদীসটিই বু খারীতে অন্যত্র 'গাযওয়ায়ে ওহুদ' অর্থাৎ ওহুদের যুদ্ধ অধ্যায়েও রয়েছে। সেখানে একই সাহাবীই বর্ণনা করেন, صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওহুদের শহীদদের জন্য ৮বছর পর এমনভাবে নামায পড়েন যেভাবে জীবিত বা মৃতদের বিদায় জানানো হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস: ১৩৪৩-১৩৪৪)

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, ইমাম শাফীর একথার অর্থ হলো, কারো মৃত্যুর পর দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হলে তার জানাযা পড়া হয় না। ইমাম শাফীর মতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন জানতে পারেন যে, তাঁর নিজের মৃত্যুর সময় সন্নিকট, তখন তিনি সেসব শহীদের কবরে গিয়ে তাদেরকে বিদায় জানিয়ে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(ফতহুল বারী, শারাহ বুখারী, আল্লামা ইবনে হিজর আসকালানী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯)

ওহুদের শহীদদের কাফন-দাফনের উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাতে খাতামান্নাবীঈনে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন,

লাশগুলো সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করার পর কাফনের কাজ আরম্ভ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, শহীদদের শরীরে যে কাপড়-চোপড় রয়েছে তা সেভাবেই থাকবে আর শহীদদের যেন গোসল দেওয়া না হয়। অবশ্য যদি কারো কাছে কাফনের জন্য অতিরিক্ত কাপড় থাকে তবে তা পরিধানের কাপড়ের ওপর যেন পেঁচিয়ে দেয়া হয়। জানাযার নামাযও তখন আদায় করা হয় নি। অতএব গোসল ও জানাযা ছাড়াই শহীদদের দাফন করা হয়। সাধারণত একটি কাপড়ে দু'জন সাহাবীকে একই কবরে এক সাথে দাফন করা হয়। যে সাহাবী কুরআন শরীফ অধিক জানতেন তাকে মহানবী (স.)-এর নির্দেশ অনুসারে কবরে নামানোর সময়ে প্রাধান্য দেওয়া হতো। তিনি আরো লিখেছেন, যদিও তখন জানাযার নামায আদায় করা হয় নি কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুরসন্নি কটবর্তী সময়ে বিশেষভাবে ওহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়ান- তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য মূলে ব্যাখ্যা করেন। হয়ত নামায পড়া হয়েছে বা দোয়া করা হয়েছে। মোটকথা খুব বিগলিত চিত্তে তাদের জানাযার নামায আদায় করেন এবং অনেক আবেগ নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২০১-৫০২)

হতে পারে তাদের জন্য দোয়া করেছেন যেভাবে পূর্বে একবার উল্লেখ এসেছে। প্রত্যেকের কবরে গিয়ে দোয়া করে থাকবেন এবং গভীর ব্যথাতুর হৃদয়ে তাদের জন্য দোয়া করেছেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আমার পিতার জন্য উহুদের যুদ্ধের ছয় মাস পর কবর প্রস্তুত করি এবং তাকে তাতে দাফন করি। তখন আমি তার দেহে কোন পরিবর্তন দেখতে পাইনি, কেবলমাত্র তার কয়েকটি দাড়ি ব্যতিরেকে, যেগুলো মাটির সাথে লেগে ছিল। (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৪)

অপর এক স্থানে ভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের সময় এক কবরে দুই ব্যক্তিকে দাফন করা হয় আর আমার পিতার সাথেও একজন সাহাবীকে দাফন করা হয়েছে। ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। তখন আমি শুধু তাকে একটি পৃথক কবরে দাফন করতে চাইলাম। অতএব আমি তাকে কবর থেকে বের করলে দেখি যে, মাটি তার দেহে কোন পরিবর্তন সাধন করে নি, শুধুমাত্র কানের মাংসপেশীর সামান্য পরিবর্তন ব্যতিরেকে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫)

উহুদের যুদ্ধের ৪৬ বছর পর হযরত আমীর মুআবিয়া নিজ শাসনামলে খাল খনন করান যার পানি উহুদের শহীদদের কবরে ঢুকে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এবং হযরত আমর বিন জমুহ্-এর কবরেও পানি প্রবেশ করে। যখন তাদের কবর খোঁড়া হয়, তখন (দেখা যায়) তাদের ওপর দুটি চাদর পড়ে ছিল। এছাড়াও এই বর্ণনাকারী বলেন যে, তাদের চেহারায় ক্ষত ছিল আর তার হাত ছিল ক্ষতের ওপর। এরপর যে বর্ণনা রয়েছে তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। আমি যদিও সেটি বর্ণনা করছি কিন্তু তা নির্ভরযোগ্য হওয়া অবশ্যক নয়। এটি যেহেতু কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে আর কোন কোন পাঠক তা অধ্যায়নও করে থাকে তাই এখানে বর্ণনা করছি-বর্ণনার উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু। হতে পারে এতে কিছুটা অতিশয়োক্তি। যাহোক তিনি বলেন, ক্ষতের ওপর থেকে যখন হাত সরানো হয় তখন সেই ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, যা অসম্ভব। তার হাত পুনরায় ক্ষতস্থানে রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কিছু এমন রেওয়ায়েতও মাঝে এসে যায়যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ্(রা.) বলেন, আমি কবরে নিজের পিতার দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল যেন তিনি ঘুমাচ্ছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৪) (কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৭)

অথচ তিনি বলেন ছয় মাস পর যখন তিনি (কবর থেকে তাকে) বের করেছিলেন তখনও মাংসপেশী কিছুটা বদলে গিয়েছিল। তাই হতেই পারে না যে ৪৬ বছর পর কোন প্রভাব পড়ে নি আর (কেবল) হাড়গোড় রয়ে যায় নি। দেহে কোন পরিবর্তন আসে নি-এমনটি হতেই পারে না-কারণ এটি প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, আমার সাথে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, হে জাবের! কারণ কী, আমি তোমাকে বিষণ্ন দেখতে পাচ্ছি? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তিনি ঋণ ও সন্তানাদি রেখে গেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে সে অবস্থার সুসংবাদ দিব না যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! অবশ্যই। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পর্দার অন্তরাল করা ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন নি। অর্থাৎ যার সাথেই আল্লাহ্ তা'লা কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতাকে আল্লাহ্ তা'লা জীবিত করেছেন আর এরপর তার সাথে সামনাসামনি কথা বলেছেন এবং বলেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে চাও যেন আমি তোমাকে দিতে পারি। তিনি নিবেদন করেন, হে আমার প্রভু! আমা কে পুনরায় জীবিত করো যেন আমি তোমার পথে পুনরায় নিহত হতে পারি। অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণি ত হয়েছে যে, এই উপলক্ষ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ নিবেদন করেন, হে আমার প্রভু! আমি তোমার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করি নি। আমার বাসনা হলো, তুমি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ কর যেন আমি তোমার নবী (সা.)-এর সঙ্গী হয়ে তোমার পথে লড়াই করতে পারি এবং তোমার পথে পুনরায় নিহত হতে পরি। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছি যে, যে ব্যক্তি একবার মৃত্যু বরণ করে তাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত করা হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিবেদন করেন যে, হে আমার প্রভু! আমার পিছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের কাছে এই কথা পৌঁছে দাও। এই উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মোটেই মৃত মনে করো না, বরং তারা যে জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রভুর সন্নিধানে রিযক সরবরাহ করা হচ্ছে। (সূরা আলে ইমরান: ১৭০)

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুত তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৩০১০)

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

(দালায়েলুন নবুয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ:৯৫৫-৯৫৬)

এই আয়াতটি পূর্বেও আমি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্র প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সংলাপ-সংক্রান্ত এই ঘটনাটির বিস্তারিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খিলাফতের পূর্বেকার এক বক্তৃতায় এভাবে তুলে ধরেন-

"এই ঘটনাটি বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য ও আকর্ষণে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, এটি এক নতুন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এটি থেকে আমরা এ-ও জানতে পারি যে। নিজ প্রভুর সাথে মহানবী (সা.)-এর কত অসাধারণভাবে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল! বান্দাদের প্রতিও স্নেহপ্রবণ ছিলেন আবার স্বীয় প্রভুর মাঝে ও অবগাহণ করছিলেন! একটি দিক নিজ সাহাবীদের প্রতি ঝুঁকে ছিল আর আরেকটি দিক পরম বন্ধুর সাথে সদা সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিল! সেই সত্তা, যিনি শান্তির সময় ***'সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা'*** [অতঃপর সে (মুহাম্মদ সা.) নিকটবর্তী হলো এবং তিনি (আল্লাহ্)-ও তাঁর দিকে নেমে আসেন।(সূরা নজম: ০৯)]-এর সর্বোচ্চ দিগন্তে সমাসীন ছিল, যুদ্ধাবস্থায়ও এক নিমিষের জন্য তাঁর থেকে পৃথক হয় নি। একটি চোখ রণক্ষেত্রের ওপর ছিল অপরটি পরম প্রিয়ের সৌন্দর্য অবলোকনে মত্ত; এক কান মমতার সাথে সাহাবীদের প্রতি উৎকর্ণ থাকলে অপরটি উর্ধ্বলোকের প্রতি নিজ প্রভুর সুমিষ্ট বাণী শ্রবণে রত; হাত কাজে ব্যস্ত, কিন্তু হৃদয় পরম বন্ধুর মাঝে বিলীন! একদিকে তিনি (সা.) সাহাবীদের সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছিলেন, অন্যদিকে খোদা তাকে সান্ত্বনা দান করছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-এর হৃদয়ের অবস্থার সংবাদপ্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা তাকে (সা.) এই সংবাদ দিচ্ছিলেন যে, হে আমার প্রতি সবচেয়ে অনুরক্ত ব্যক্তি, দেখ! তোমার ভালোবাসায় আমার তত্ত্বজ্ঞানী বান্দাদের হৃদয় কীভাবে পূর্ণ করে দিয়েছি যে,নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পরও তোমার চিন্তা তাদের এভাবে উদ্বেলিত করতে থাকে; আর তোমাকে যুদ্ধের ময়দানে একাকী রেখে যাওয়ার কারণে তারা কতই না মর্মপীড়ার শিকার! তোমার বিপরীতে জান্নাতের কোন লোভ তাদের নেই! বারংবার তীক্ষ্ণ তরবারির মাধ্যমে খণ্ডবিখণ্ড হলেও তাদের জান্নাত হলো তোমার সাথে থাকা, তোমার সাথে থাকা আবার তোমার সাথে থাকতে পারা!

(খুতবাতে তাহের, জলসা সালানার বক্তব্য, ১৯৭৯ সাল, পৃ: ৩৪৯-৩৫০)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্(রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। পাওনাদারদের বুঝিয়ে তার ঋণ কিছুটা হ্রাস করে দেওয়ার জন্য আমি মহানবী (সা.)-এর সাহায্য চাই। মহানবী (সা.) তাদের কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু তারা ছাড় দেয় নি। তখন মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, যাও, তোমার প্রত্যেক প্রকার খেজুর পৃথক পৃথক রাখ; আজওয়া খেজুর পৃথক রাখবে এবং ইযক বিন যায়েদ খেজুর পৃথক রাখবে; এরপর আমাকে সংবাদ পাঠাবে। আমি এমনটিই করি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আসার জন্য বার্তা পাঠাই। তিনি (সা.) এসে খেজুরের স্তূপে বা সেগুলোর মাঝে বসে পড়েন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে মেপে মেপে দাও। আমি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে থাকি; এক পর্যায়ে তাদের পাওনা সম্পূর্ণ তাদের হাতে তুলে দিই, তারপরও আমার খেজুর উদ্বৃত্ত রয়ে যায়।এমন মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো একটুও কমে নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-২১২৭)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) নিজের ছেড়ে যাওয়া পরিবারে তার পুত্র জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ ছাড়াও ছয়জন কন্যা রেখে গিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর নিজের পেছনে সাতজন বা নয়জন কন্যা রেখে গিয়েছিলেন।

(সুনানে নিসাই, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস-৩৬৬৬) (বুখারী, কিতাবুন নাফাকাত, হাদীস-৫৩৬৭)

পরবতী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হযরত আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা (রা.)। হযরত আবু দুজানা আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সায়েদার সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল খারাশা; কেউ কেউ বলে তার পিতার নাম ছিল অওস এবং দাদার নাম ছিল খারাশা। হযরত আবু দুজানার মাতার নাম ছিল হাযমা বিনতে হারমালা।

তিনি নিজের আসল নামের চেয়ে আবু দুজানা ডাকনামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। হযরত আবু দুজানার এক পুত্র ছিল, যার নাম ছিল খালেদ।তার মায়ের নাম ছিল আমেনা বিনতে আমর।

(উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৯, প্রকাশক-দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার ও হযরত আবু দুজানার মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২০)

তিনি (রা.) বদর ও উহুদসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। (উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

হযরত আবু দুজানাকে আনসারদের জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হতো। তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত যুদ্ধসমূহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১২)

যুদ্ধের ময়দানে হযরত আবু দুজানা (রা.) পরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন আর তিনি পরম দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। তার একটি লাল রঙের রুমাল ছিল যা কেবল যুদ্ধের সময়ই তিনি মাথায় বাঁধতেন। তিনি যখন সেই লাল রুমাল মাথায় বাঁধতেন তখন মানুষ বুঝে যেত যে, এখন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। হযরত আবু দু জানা (রা.) সাহসী এবং বীর পুরুষদের মাঝে পরিগণ্য হতেন। (উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু দুজানাকে যুদ্ধক্ষেত্রে তার লাল পাগড়ির কারণে চেনা যেত এবং বদরের যুদ্ধেও এটি তার মাথায় ছিল। মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, হযরত আবু দুজানা (রা.) উহুদের যুদ্ধেও একইভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে মহানবী (সা.)-এর সাথে অবিচল ছিলেন আর মৃত্যুর শর্তে তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২০)

উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু দুজানা (রা.) এবং হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) পরম বীরত্বের সাথে মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় হামলাকারীদের প্রতিহত করেন। সেদিন হযরত আবু দুজানা (রা.) মারাত্মক আহত হন আর হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)শাহাদাত বরণ করেন। (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৯)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, উহুদের দিন মহানবী (সা.) একটি তরবারি হাতে নেন এবং বলেন, ***'মাঁইয়া' খুযু মিন্নি হাজা'*** অর্থাৎ, কে আমার কাছ থেকে এটি নিতে চায়? সবাই তখন নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে বলে, আমি নিতে চাই, আমি। মহানবী (সা.) পুনরায় বলেন, ***'মাঁইয়া খুযুহু বিহাক্কিহী'*** অর্থাৎ, কে এটির প্রতি সুবিচারের শর্তে গ্রহণ করতে চায়? হযরত আনাস (রা.) বলেন, এটি শুনে সবাই থেমে যায়। তখন হযরত সিমাক বিন খারাশা আবু দুজানা (রা.) বলেন, আমি এটির যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে এটি গ্রহণ করছি। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এরপর তিনি এই তরবারি গ্রহণ করেন এবং মুশরিকদের গর্দান কর্তন করেন। এটি মুসলিম শরিফে বর্ণীত হাদীস।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৬৩৫৩)

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু দুজানা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এটির যথার্থ অধিকার প্রদান বলতে কী বুঝায়? তখন মহানবী (সা.) বলেন, এর মাধ্যমে কোন মুসলমানকে হত্যা করবে না এবং এটি থাকতে কোন কাফিরের ভয়ে পলায়ন করবে না, অর্থাৎ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে। এটি শুনে হযরত আবু দুজানা (রা.) বলেন, আমি এরপ্রতি সু বিচারের শর্তে এটিগ্রহণ করছি। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু দুজানাকে উক্ত তরবারি প্রদান করেন তখন তিনি তা দিয়ে মুশরিকদের মুণ্ডুপাত করেন। সেসময় তিনি এই পংক্তিগুলো পড়ছিলেন-

أَنَا الَّذِىْ عَاهَدَنِىْ خَلِيْلِىْ
وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيْلِ

اَنْ لَّا أَقُوْمَ اللَّهْرَ فِى الْكَيُوْلِ
أَضْرِبْ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُوْلِ

অর্থ: আমি সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে আমার বন্ধু অঙ্গীকার নিয়েছেন, যখনকিনা আমরা সাফাহ্ নামক স্থানে খেজুর বৃক্ষের নিকটে ছিলাম। সেই অঙ্গীকার হলো, আমি সৈন্যবাহিনীর পিছনের সারিতে দাঁড়াব না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর তরবারি দিয়ে শত্রুর সাথে যু দ্ধ করবো। হযরত আবু দুজানা (রা.) অহংকারপূর্ণ চলনভঙ্গিতে সেনাবাহিনীর সারিগুলোর মাঝে বিচরণ করতে থাকেন। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) বলেন, إِنَّ هٰذِهٖ مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ অর্থ: এটি এমন চলার ভঙ্গি যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট অপছন্দনীয়,কেবল এ স্থান ব্যতীত, অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দান ছাড়া।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা , ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০০) (উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন একটি তরবারি উপস্থাপন করে বলেন, مَنْ يَأْخُذُ هٰذَا السَّيْفَ بِحَقِّهٖ অর্থাৎ, কে আছে যে এই তরবারিকে এর প্রতি সুবিচারের শর্তে গ্রহণ করবে? হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বলি, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আমি। মহানবী (সা.) আমাকে উপেক্ষা করেন। মহানবী (সা.) পুনরায় জিজ্ঞাস করেন, কে আছে যে এই তরবারিকে এর যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে গ্রহণ করবে? আমি পুনরায় নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি। মহানবী (সা.) আবারও আমাকে উপেক্ষা করেন। তিনি (সা.) আবারও বলেন, কে আছে যে এই তরবারিকে এর যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে গ্রহণ করবে? হযরত আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি এই তরবারিকে এর যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে গ্রহণ করছি, আর এর যথার্থ অধিকার কী? তিনি (সা.) বলেন, এর দ্বারা কোন মুসলমানকে হত্যা করবে না, এটি থাকতে কোন কাফেরের ভয়ে পলায়ন করবে না এবংদৃঢ়তার সাথে লড়াই করবে। হযরত যুবায়ের বলেন,এরপর মহানবী (সা.) আবু দুজানাকে তরবারিটি প্রদান করেন। হযরত আবু দুজানার এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন যুদ্ধের সংকল্প করতেন তখন লাল রুমাল নিজের মাথায় বেঁধে নিতেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম আজ আমি দেখব যে, তিনি কীভাবে এই তরবারির যথার্থ অধিকার প্রদান করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন,আবু দুজানার সামনে যে-ই এসেছে তিনি তাকে হত্যা আর কচুকাটা করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন, এমনকি তিনি শত্রুসৈন্যদের সারি বিদীর্ণ করে তাদের মহিলাদের কাছে পৌঁছে যান, যারা পাহাড়ের পাদদেশেঢোল বাজাচ্ছিল আর তাদের মধ্যে একজন মহিলা কবিতার একটি পঙক্তি পড়ছিল, যার অর্থ হচ্ছেআমরা তারেক অর্থাৎ প্র ভাত-নক্ষত্রের কন্যা, যারা মেঘমালায় বিচরণ করে, যদিতোমরা সামনে এগিয়ে যাও তবে আমরা তোমাদের আলিঙ্গান করব আর তোমাদের বসার জন্য বালিশ বিছিয়ে দিবো। কিন্তু তোমরা যদি (রণক্ষেত্রে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তবে আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। এটি এমন বিচ্ছেদ হবে যে, এরপর আমাদের ও তোমাদের মাঝে ভালোবাসার আর কোন সম্পর্ক বাকি থাকবে না।

হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি যে, আবু দুজানা (রা.) এক মহিলাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তরবারি উচ্চকিত করেন কিন্তু আবার থেমে যান। যুদ্ধশেষ হলে আমি তাকে বলি, আমি আপনার সমস্ত রণনৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি। আপনি একজন মহিলার ওপর তরবারি উঁচিয়ে আবার নামিয়ে নিয়েছেন- এর কারণ কী ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কোন নারীকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তরবারির সম্মান করেছি। এটি অসম্ভব যে, আমি কোন নারীকে হত্যার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তরবারি ব্যবহার করব; তাই আমি বিরত থাকি। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই মহিলা ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ; যে অন্যান্য মহিলার সাথে একত্রে রণসঙ্গীত পরিবেশন করছিল। হযরত আবু দুজানা (রা.) তার ওপর যখন তরবারি উঁচু

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করেন তখন সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে বলে– সাখার! সাখার! কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। হযরত আবু দুজানা (রা.) তাঁর তরবারি নিচে নামিয়ে নেন এবং ফিরে যান। হযরত যুবায়ের (রা.) প্র শ্ন করলে তিনি (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তরবারি দিয়ে কোন অসহায় মহিলাকে হত্যা করাকে আমি পছন্দ করিনি।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪০-৪৪১) (শারাহ আল্লামা যুরকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৬)

হযরত আবু দুজানা (রা.)-এর উক্ত ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, সম্মুখ সমরে কাফের কুরাইশদের পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এই দৃশ্য অবলোকন করে কাফেররা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে গণহামলা করে দেয়। মুসলমানরাও নারায়ে তকবীর উচ্চকিত করে সামনে এগিয়ে যায় আর উভয় সেনাদল পরস্পর তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খুব সম্ভব তখনই মহানবী (সা.) নিজ তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এই তরবারি নিয়ে এর প্রতি সুবিচার করবে? গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনেক সাহাবী নিজেদের হাত বাড়িয়ে দেন,যাদের মাঝে হযরত উমর, হযরত যুবায়ের, বরং কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বকর এবং হযরত আলীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) নিজের হাত গুটিয়ে রাখেন এবং এটিই বলতে থাকেন যে, এই তরবারির প্রতি সুবিচার করবে এমন কেউ আছে কি? পরিশেষে হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা.)নিজের হাত বাড়ান এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অনুগ্রহ করে আমাকে দিন।তিনি এই তরবারি তাকে দিয়ে দেন আর আবু দুজানা তা হাতে নিয়ে সদম্ভে কাফেরদের দিকে অগ্রসর হন। মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলে, আল্লাহ্ তা'লা এমন চলনভঙ্গি অপছন্দ করেন তবে এমন ক্ষেত্রে নয়। যুবায়ের যিনি মহানবী (সা.)-এর তরবারি লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন আর নিকটাত্মীয় হবার সুবাদে তার অধিকার সবচেয়ে বেশি বলে মনে করতেন, অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেন যে, ঘটনা কী? মহানবী (সা.) আমাকে ঐ তরবারি কেন দিলেন না অথচ আবু দুজানাকে দিলেন? নিজের এই দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য মনে মনে সংকল্প করলেন যে, আমি যুদ্ধের ময়দানে আবু দুজানার সাথে সাথে থাকবো আর দেখবো যে, তিনি এই তরবারি দিয়ে কী করেন। মোটকথা তিনি বলেন, আবু দুজানা নিজের মাথায় এক টুকরো লাল কাপড় বাঁধলেন আর সেই তরবারি নিয়ে আল্লাহর প্রশংসাগীত গুনগুণিয়ে মুশরিকদের সারিতে ঢুকে পড়েন আর আমি দেখছিলাম, যেদিকেই সে যাচ্ছিলেন, সেদিকেই মৃত্যুর মিছিল পড়ছিল আর আমি এমন কাউকে দেখি নি যে তার সামনে এসেছে আর প্রাণে বেঁচে গেছে। এমনকি তিনি কুরায়েশ সেনাদলের মাঝে নিজের পথ বানিয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে যান যেখানে কুরায়েশদের মহিলারা দাঁড়িয়ে ছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা- যে কিনা নিজেদের পুরুষদেরকে হিংস্রভাবে রণে উজ্জীবিত ও উত্তেজিত করছিল, সে তার সামনে আসে। আবু দুজানা তার ওপর স্বীয় তরবারি উঠান। এতে হীন্দ গগনবিদারী কণ্ঠে চিৎকার করে আর পুরুষদের সাহায্যের জন্য ডাকে কিন্তু ে কউ তার সাহায্যে আসে নি। হযরত যুবায়ের বলেন, আমি দেখলাম আবু দুজানা স্বয়ং নিজতরবারি নামিয়ে ফেললেন আর সেখান থেকে ফেরত চলে এলেন। যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, আমি তখন আবু দুজানাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কী? প্র থমে আপনি তরবারি উঠিয়ে আবার তা আনত করে ফেললেন? তিনি বলেন, আমার মন সায় দেয় নি যে, মহানবী (সা.)-এর তরবারি দিয়ে এক মহিলাকে আঘাত করব আর মহিলাও এমন যার সাথে কোন সুরক্ষাকারী পুরুষও উপস্থিত নেই। যুবায়ের বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম,মহানবী (সা.)-এর তরবারির যে অধিকার আবু দুজানা আদায় করেছেন, হয়তো আমি তা করতে পারতাম না। এভাবে আমার মনের অস্বস্তি দূর হয়ে গেল।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৪৮৯-৪৯০)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) একটি তরবারি দিয়ে বলেন, আমি এই তরবারি তাকেই দিব- যে এর প্রতি সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দি বে। অনেকেই সেই তরবারি গ্রহণে আগ্রহ দেখালেন। তিনি (সা.) আবু দুজানা আনসারীকে সেই তরবারি প্রদান করলেন। যুদ্ধের ময়দানের এক জায়গায় মক্কাবাসীদের কিছু সৈন্য আবু দুজানার ওপর আক্রমণ করে। তিনি যখন তাদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তখন দেখলেন, একজন সৈন্য তাদের মাঝে সর্বোচ্চ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছে। তিনি তরবারি উচিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তার কাছে যান কিন্তু তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর কোন বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাকে কেন ছেড়ে দিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যখন তার কাছে গেলাম তখন তার মুখ থেকে এমন একটি বাক্য বের হল, যাতে আমি বুঝে গেলাম- সে পুরুষ নয় বরং মহিলা। সেই বন্ধু বললেন, যা-ই হোক, সে তো অন্য সৈন্যদের ন্যায়যুদ্ধ করছিল, তবুও কেন আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন? আবু দুজানা বললেন, আমার কাছে এটি অসহনীয় ছিল যে, আমি মহানবী (সা.) এর তরবারি এক দূর্বল মহিলার উপর চালাব। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, মোটকথা, মহানবী (সা.) সর্বদা মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন, যার কারণে কাফের মহিলারা বড় ধৃষ্টতার সাথে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতো কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা তা সহ্য করতেন।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২১-৪২২)

প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মুইর আবু দুজানা সম্পর্কে লেখেন যে, যুদ্ধের সূচনাতেই মহানবী (সা.) তাঁর তরবারী হাতে নিলেন এবং বললেন কে আছে যে এই তরবারী নিবে এবং এর সাথে সুবিচার করবে। উমর যুবায়ের এবং আরোও অনেক সাহাবী এটি নেওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে এটি প্রদান অস্বীকৃতি জানান। সবশেষে যখন আবু দুজানা আবেদন করেন তখন মহানবী (সা.) তাকে এটি প্রদান করেন এবং তিনি এটি দিয়ে কাফেরদের শিরোচ্ছেদ করতে লাগলেন।

(Life of Mahomet by Sir William Muir, pg: 269, Smith Elder & Co, waterloo place London, 1878)

তারপর তিনি লিখেন, মুসলমানদের ভয়ানক আক্রমনের সামনে কুরাইশ বাহিনীর পা নড়বড়ে হতে দেখা যায়। কুরাইশদের আশ্বারোহী বাহিনী পেছন থেকে এসে কয়েকবার মুসলিম সেনাদলের বাম দিকে আক্রমণের চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেক বারই তাদের সেই ৫০জন তিরন্দাজের তির খেয়ে পিছিয়ে যেত যাদেরকে মহানবী (সা.) বিশেষ ভাবে সেখানে নিযুক্ত করেছিলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে উহুদের ময়দানেও একই ধরণের সাহসিকতা, পৌরুষ আর মৃত্যু ও বিপদের প্রতি সেই ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করা হয়েছে যা তারা বদরের যুদ্ধের সময় দেখিয়েছিল। নিজের শিরস্ত্রাণে লাল রুমাল বেধে আবু দুজানা যখন কোরাইশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন তখন মক্কী বাহিনীর সারিতে বারবার ফাটল দেখা দিতে থাকে। মহানবী (সা.) তাকে যে তরবারী দিয়েছিলেন সে তরবারী দিয়ে চতুর্দিকে তিনি মৃত্যুপুরী রচনা করছিলেন। হামযা (রা.) কে নিজের মাথায় উট পাখির পালক পরিহিত অবস্থায় সর্বত্র স্পষ্টভাবে দেখা যেতো। আলী তার লম্বা এবং সাদা পতাকা নিয়ে এবং যুবায়ের তার উজ্জ্বল হলুদ রঙের পাগড়ী পরে ইলিয়ডের বীরদের ন্যায় যেখানেই যেতেন শত্রুদের জন্য মৃ ত্যু ও মর্মজ্বালার বাণী বহন করতেন। এটি সেই দৃশ্য যেখানে পরবর্তীতে ইসলামী বিজয়ের বীর সেনানীরা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯০)

এখন আমি যা পড়লাম তা সীরাতে খাতামান্নাবীঈন এ উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ থেকে ফিরে এসে তাঁর মেয়ে ফাতেমাকে তরবারী দিয়ে বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা এটি ধুয়ে রক্ত পরিস্কার করে দাও। হযরত আলী (রা.)ও তাকে (অর্থাৎ হযরত ফাতেমাকে) তাঁর তরবারি দিলেন এবং বললেন এটিও ধুয়ে রক্ত পরিস্কার করে দাও, আল্লাহ্‌র কসম এটি আজ বিশ্বস্ততার সাথে আমায় সঙ্গ দিয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যদি যুদ্ধে তোমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে থাকো, তাহলে নিশ্চয় সাহ্‌ল বিন হুনায়ফ ও আবু দুজানাও যুদ্ধে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে। একটি রেওয়ায়েতে সাহ্‌ল বিন হুনায়ফের পরিবর্তে হারেস বিন সিম্মা'র নামও

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

এসেছে।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭)
(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২০)

যায়েদ বিন আসলাম বর্ণ না করেন, হযরত আবু দুজানা (রা.) অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে লোকেরা তাকে দেখার জন্য আসে, সে সময়ও তার চেহারা ঝলমল করছিল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার চেহারার ঔজ্জ্বল্যের কারণ কী? এর উত্তরে হযরত আবু দুজানা (রা.) বললেন, আমার কর্মগুলোর মধ্যে এমন দু'টি কর্ম রয়েছে যা আমার নিকট অনেক বেশী ভারী এবং পরিপক্ক। প্রথমটি হলো আমি কখনো এমন কথা বলি না যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার হৃদয় মুসলমানদের জন্য সর্বদা পরিষ্কার থাকে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২০)

হযরত আবু দুজানা (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। মুসায়লামা কায্যাব যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর মিথ্যা নবুয়তের দাবী করে মদীনার বিরুদ্ধে সেনাভিযানের ষড়যন্ত্র করলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দমনের লক্ষ্যে ১২ হিজরীতে সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। হযরত আবু দুজানা (রা.)ও সেই সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু দুজানা (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সাহসিকতার সাথে যু দ্ধকরেন এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। একটি প্রাচীন আরব গোত্র 'বনু হুনায়ফা'-র একটি বড় অংশ যারা মুসায়লামা কায্যাবের নেতৃত্বে মদীনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ইয়ামামাতে তাদের একটি বাগান ছিল, যাতে পরিবেষ্টিত অবস্থায় তারা যুদ্ধ করছিল। মুসলমানরা তাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছিল না। হযরত আবু দুজানা মুসলমানদের বললেন, 'আমাকে বাগানের ভিতরে নিক্ষেপ কর', মুসলমানরা তাই করলো। কিন্তু বিপরীত দিকে পড়ে যাওয়ার কারণে তার পা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এরপরও তিনি বাগানের ফটকের নিকট লড়তে থাকেন এবং মুশরেকদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন আর মুসলমানরা ভিতরে প্রবেশ করে। হযরত আবু দুজানা (রা.) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ এবং ওয়াহশী বিন হারবের সাথে মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যায় অংশ নেন। ইয়ামামার যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৯)(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৮) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২০)

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু দুজানা (রা.) সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা.) পক্ষে যুদ্ধ করে মারা যান; কিন্তু এটি দূর্বল রেওয়ায়েত আর প্রথমটি বেশি সঠিক এবং অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে। পরের কথাটি আমি এর পূর্বেও বর্ণনা করেছি এখানেও কিছু অংশ বর্ণনা করছি কেননা হযরত আবু দুজানার (রা.) সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আবু দুজানা (রা.) আনসারী ছিলেন। মহানবী (সা.) এর মদীনা হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরল সম্মান রাখতেন এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন; একইভাবে উহুদের যুদ্ধেও অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। যুদ্ধের পট পরিবর্তনের পরে অর্থাৎ প্রথমে মুসলমানরা বিজয় লাভ করছিল; এরপর পট পরিবর্তন হয় এবং একটি স্থান ছেড়ে দেওয়ার কারণে কাফেররা পুনরায় আক্রমণ করে আর যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে যায়। সে সময় যেসব সাহাবী মহানবী (সা.) এর পাশে ছিলেন তাদের মাঝে হযরত আবু দুজানা (রা.) ও ছিলেন। মহানবী (সা.) এর নিরাপত্তায় তিনি গুরুতর আহত হন কিন্তু তা সত্ত্বেও পিছপা হন নি। একবার অসুস্থতাবস্থায় নিজের একজন সঙ্গীকে বলেন যে, হয়তো আমার দু'টি কর্ম আল্লাহ তা'লার নিকট গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে। একটি হল আমি বৃথা কথা বলি না, গীবত করি না; লোকদের পিছনে তাদের কুৎসা করি না। দ্বিতীয়ত, কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে আমার মনে কোন ঘৃণা ও বিদ্বেষ নেই।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত, ১৬ই মার্চ, ২০১৮)

এখানে তার স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির উল্লেখ করব। তাদের জানাযার নামাযও পড়াবো। তাদের মাঝে একজন শহীদও রয়েছেন যাকে সম্প্রতি শহীদ করা হয়েছে। তিনি হলেন পেশাওয়ার জেলার সাইয়্যেদ জালাল সাহেবের পুত্রশ্রদ্ধেয় মাহবুব খান সাহেব। মাহবুব খান সাহেবকে বিরোধীরা ৮ নভেম্বর ২০২০ ইং সকাল আটটায় পেশাওয়ারের শেখ মোহাম্মদী গ্রামে গুলি করে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিস্তারিত বিবরণ হলো,মাহবুব খান সাহেব ৬ নভেম্বর পেশাওয়ারের খুশহাল টাউন থেকে নিজ দৌহিত্রীর সাথে দেখা করতে যান যে নিজের পরিবারসহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম শেখ মুহাম্মদীতে বসবাস করে। ৮ নভেম্বর ফেরত আসার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে বাসস্ট্যান্ডের নিকটে পৌঁ ছালে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি পিছু নিয়ে তাকে গুলি করে। একটি গুলি পিছন থেকে মাথায় লাগে এবং সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়; যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঘটনার পর একক ঘাতক পালিয়ে যায়। শহীদ মরহুমের বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর। মরহুম পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ২০০২ সালে অফিসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে অবসর নেওয়ার পর পেনশনার হিসেবে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। মরহুমের পিতা সৈয়্যদ জালাল সাহেব ১৯৩০ এর দশকে বয়আত গ্রহণ করেন। শহীদ মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন।

মরহুম অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। ভদ্রতা, সহানুভূতি এবং অতিথিপরায়নতা ছাড়াও দানশীলতায় অভ্যস্ত ছিলেন। তবলীগের আগ্রহ উন্মাদনার পর্যায়ে ছিল। তবলীগের জন্য সদা সোচ্চার থাকতেন। যখনই তাকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হত তার বক্তব্য হত; এখন তো এমনিতেই খোদার দরবারে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে; যদি শাহাদাত বরণ করতে পারি তাহলে এটি আমার সৌভাগ্য হবে। তার শাহাদাত লাভের আকাঙ্খাও পূরণ হয়েছে। শহীদ মাহবুব খান সাহেবের স্ত্রী মিরাজ বেগম সাহেবার সতন্ত্র মর্যাদা হলো, তার পিতা মুহাম্মদ সাঈদ সাহেব এবং চাচা বশীর আহমদ সাহেব ১৯৬৬ সালে শহীদ হয়েছিলেন আর এ সৌভাগ্য এখন তার স্বামী লাভ করেছে। এভাবে তিনি একজন শহীদের কন্যা, শহীদের ভাতিজি এবং একজন শহীদের স্ত্রীও।

তিনি যাদের পেছনে রেখে গেছেন তারা হলেন তার স্ত্রী মোহতরমা মে'রাজ বেগম সাহেবা, দুই ছেলে মনোয়ার সাহেব এবং ফজল আহমদ সাহেব, দুই মেয়ে জাকিয়া বেগম সাহেবা ও ওয়াহীদা বেগম সাহেবা। এছাড়া ছেলেদের ঘরে তিন পৌত্র তিন পৌত্রী আর মেয়েদের দিক থেকে ছয় দৌহিত্র ও চার দৌহিত্রী রয়েছে। তার ছোট ছেলে মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচডি করেছেন।তিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় আছেন আর অপরজন ফজল আহমদ সাহেবও সুশিক্ষিত আর ইংরেজীতে এমএ করেছেন; তিনি জার্মানীতে বসবাস করেন।

তার ছেলে মনোয়ার আহমদ খান সাহেব বলেন, মাহবুব খান সাহেব নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বদা সোচ্চার থাকতেন। কখনো কখনো দুই বিবদমান দলের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে রক্তপণও দিয়ে দিতেন। গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তার কাছে আসতো এবং তিনি তাদের সাহায্যের জন্যসবসময় কিছু না কিছু নগদ অর্থ এবং খাদ্যশস্য প্রভৃতি রেখে দিতেন। অতিশয় নম্র ও নীরব স্বভাবের মানুষ ছিলেন। পরম ধৈর্যশীল এবং অন্যের কষ্টের প্রতি সংবেদশীল আর তাদের সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের পদর্মাদা উন্নীত করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকেও তার পুণ্যকর্মকে অব্যহত রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা পাকিস্তান নিবাসী মুরব্বী সিলসিলাহ্ ফখর আহমদ ফরখ সাহেবের। ১ নভেম্বর ২০২০ সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার সময় তিনি তার ছেলে এহতেশাম আব্দুল্লাহর সাথে আহমদ নগর থেকে ফিরার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। খুবই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ছিল, পিতা পুত্র উভয়ই ঘটনাস্থলেই মারা যান।

আল্লাহ তা'লার কৃপায় ফখর সাহেব মুসী ছিলেন। ফখর সাহেবের পিতা সাইফুর রহমান সাহেব নিজে বয়আত করেছিলেন। তার পরিবারে এর পূর্বে আর কোন আহমদী ছিল না। ১৯৬৮ সনে তিনি বয়আত করেছিলেন আর এভাবে তিনি তার বংশের প্র থম আহমদী হন। ফখর সাহেব ১৯৯৬ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবোয়া থেকে উত্তীর্ণ হবার পর পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করার সৌভাগ্য পান। এরপর তাকে পশ্চিম আফিকার

আইভেরিকোস্টে পাঠানো হয় এরপর গত আট বছর ধরে পাকিস্তানের আহমদনগরে মুরব্বী সিলসিলাহ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আলী আসগর সাহেবের কন্যা তাহেরা ফখর সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের চার মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান হয়। পুত্র এহতেশাম আব্দুল্লাহ পিতার সাথে এই দুর্ঘ টনাতেই মারা যায় এখন শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ও চার মেয়ে রয়েছেন এছাড়া রয়েছেন তার মা ও ভাই বোন । তার মেয়েরা হল, ওয়াজীহা, আমাতুস্ সুবূহ, স্নেহের খাফিয়া ফখর সামারীন ফখর এবং মেহরীন ফখর।

ফখর সাহেবের স্ত্রী তাহেরা সাহেবা লেখেন, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন মুরব্বী সাহেবের পোস্টিং ছিল খোশাবের একটি গ্রামে অর্থাৎ সেখানে তিনি কর্মরত ছিলেন। আমি যখন সেই সেন্টারে যাই তিনি আমাকে একজন মুরব্বীর স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলেন এবং আমাকে বুঝান যে, এখন তুমিও আমার সাথে ওয়াকেফে জিন্দেগী, তোমাকেও জামাতের কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত। এভাবে তিনি তরবিয়ত করেছেন। এরপর বাদীনে তার বদলি হয়ে যায়। মুরব্বী সাহেব প্রথমে চলে যান তার স্ত্রী কিছু দিন পর তার সাথে যোগ দেন। তিনি বলেন, যেদিন আমি সেখানে পৌঁছি যাবার পূর্বে আমি তাকে অবগত করে রেখেছিলাম কিন্তু সেখানে যাবার পর দেখি মুরব্বী সাহেব সেন্টারে নেই, আমি মসজিদের বাইরে রোদে বসে থাকি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি কোন মোয়াল্লেম সাহেবের অসুস্থ স্ত্রীর রক্তের প্রয়োজন ছিল তাই মুরব্বী সাহেব তাকে রক্ত দেওয়ার জন্য গেছেন। তিনি যখন ফিরে আসেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, এতক্ষণ ধরে আমি রোদে বসে আছি আপনি তো জানতেন যে, আমি দীর্ঘ সফর করে আসছি। তিনি উত্তরে বলেন, সেই কাজটিও খুব গুরুত্ব পূর্ণ ছিল আর আমাকে বুঝালেন, এভাবেই কুরবানী করতে হয়।

তিনি যখন আইভরি কোস্টে যান, সেখানেও ধর্মের কাজের পাশাপাশি ব্যাপক মানব সেবামূলক কাজ করতে থাকেন। সর্বদা স্ত্রী সন্তানদের ওপর ধর্মকে অগ্রগণ্য রেখেছেন। তার স্ত্রী বলেন, আমার কন্যা জন্মের সময় একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তিনি মেডিকেল ক্যাম্প এর কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। ডাক্তার আমার অবস্থা আশঙ্কাজনক বললেও তিনি আমাকে রেখে কাজে চলে যান। যাওয়ার পূর্বে শুধু এতটু কু বলে যান, আল্লাহ কৃপা করবেন, তুমি ওয়াকেফে যিন্দেগীর স্ত্রী, তোমার কিছুই হবে না। মোটকথা মুরুব্বী সাহেব প্রত্যেকটি বিষয়ে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অতিথিসেবা, সৃষ্টিসেবা ও ধর্মসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। আপন ও পর, সকলকেই ভালবাসতেন। সন্তানদের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ছিল। কোন সমস্যা তা পারিবারিক হোক বা আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, জামাতী কোন বিষয় হোক কিংবা অআহমদীদের বিষয়ই হোক সকল ক্ষেত্রে তিনি খুবই উত্তম ভাবে বু ঝাতেন। নিজ সন্তানদেরও বুঝাতেন, তোমরা ওয়াকেফে যিন্দেগী ও এক মুরুব্বীর সন্তান তাই সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে এবং নিজেদের উত্তম আদর্শ স্থাপন করবে।

আইভোরি কোস্টের মুরুব্বী ওয়াসে সাহেব বলেন, ফখর সাহেব মুবাল্লেগ হিসেবে আইভোরি কোস্টে আসেন। তিনি খুবই মিশুক, হাস্যোজ্জ্বল এবং পুণ্য স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। মনমুগ্ধকর বাচনভঙ্গি ছিল তার ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিক। যার সাথেই মিশতেন সে তার ভক্ত হয়ে যেতো। পাঁচ বছর অওমে রিজিওনে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা করেছেন। তার উত্তম চরিত্র ও সহমর্মিতার কারণে ছোট বড় সকলেই তার সাথে সুসম্পর্ক রাখত এবং সর্বদা তারা তার কথা স্ব রণ করে। জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করার জন্য কতক দরিদ্র আহমদীকে গোপনে যাতায়াত খরচ প্রদান করতেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে তার রিজিওন উপস্থিতির দিক দিয়ে সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করত। সেখানকার স্থানীয় মুয়াল্লেম সোমারো হারুন সাহেব বলেন, আড়াই বছর আমি তার সাথে কাজ করেছি। নিজ ভাইয়ের মত তিনি আমার খেয়াল রেখেছেন। যে বিষয়টি বিশেষভাবে আমি লক্ষ্য করেছি তা হল, খুবই পরিশ্রমী ও উদ্দ্যমী মুবাল্লেগ ছিলেন। প্রতিটি কাজ দায়িত্বশীলতার সাথে ও নিমগ্নচিত্তে করতেন। দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার এক উন্মাদনা ছিল তা তবলীগের কাজ হোক কিংবা চাঁদা উঠানোর কাজ কিংবা জলসা সালানার প্রস্তুতির বিষয়ই হোক। তবলীগের প্রেরণা এমন ছিল যে, তিনি চাইতেন যতদ্রুত সম্ভব প্রতিটি গ্রামে যেন জামাতের সংবাদ পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন এবং সব ধরণের দুশ্চিন্তা ও বিপদাবলী থেকে তাদের রক্ষা করুন।

তৃতীয় জানাযা মুরুব্বি ফখর আহমদ ফরখ সাহেবের পুত্র এহতেশাম আহমদ আব্দুল্লাহ্র। যেমনটি আমি বলেছি সেও তার পিতার সাথে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফেনও এর কল্যাণময় স্কীমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। সে মূসী ছিল না, কিন্তু ওসয়ীত ফর্ম পূরণ করেছিল, এখনো জমা দেয়নি। যাহোক যদি ফর্ম পূরণ করা থাকে তাহলে করপরদায ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তার মা বলেন, আমার পুত্র অনেক গুণাবলির অধিকারী ছিল। পুণ্যবান এবং অনুগত ছিল। ওয়াকফে নও এর তাহরীকে অন্তভু´ক্ত ছিল। নিয়মিত নামায আদায়কারী ছিল। খোদ্দামুল আহমদীয়ার যয়ীম সাহেবের সকল আদেশ পালন করত এবং ডিউটি প্রভৃতি অত্যন্ত সুচারুরুপে পালন করত আর যেদিন ইন্তেকাল করে সেদিনও মসজিদে ডিউটি দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবতী জানাযা রাবওয়ার মিয়া আব্দুল লতীফ সাহেবের পুত্র মুকাররম ডক্টর আব্দুল করীম সাহেবের যিনি স্ট্যাট ব্যাংক অব পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত ইকোনোমিক উপদেষ্টা ছিলেন। ৯২ বছর বয়সে ১৪ সেপ্টেম্বরে তিনি পরলোকগমন করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের পৌত্র ছিলেন। কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষাথী ছিলেন। দেশ বিভাগের পর যখন কলেজ লাহোরে স্থানান্ত রিত হয় তখন তালীমুল ইসলাম কলেজের শিক্ষাথী হিসেবে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ করেন। তখন গোটা বিশ্ব বিদ্যালয়ে তিনি তালীমুল ইসলাম কলেজের একমাত্র শিক্ষার্থী ছিলেন। পরবর্তীতে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বৃত্তি নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি করার মানসে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে তিনি মসজিদ ফযলে থাকতেন এবং অবসর সময়ে তবলীগি কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকতেন। পাকিস্তানের প্রতি ডক্টর সাহেবের সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। তিনি তার পেশাগত জীবনে বিশ্ব ব্যাংক এর মত আন্তর্জাতিক প্র তিষ্ঠানের সাথে স্থায়ীভাবে কাজ করা সত্ত্বেও সর্বদা পাকিস্তানে থেকে কাজ করাই পছন্দ করেছেন। দীর্ঘদিন স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানে চাকরী করেন এবং উপদেষ্টার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নিজের যুগে তিনি IMF এবং এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানের সাথে অনেক দেশী ও বিদেশী এসাইনমেন্ট বা কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। কিছুদিন ট্রেজারী বা কোষাগারে কাজ করেছেন এবং একটি ফেডারেল বাজেটও তার তত্ত্বধানে প্রণীত হয়। IMF এর পক্ষ থেকে তাকে দু'বছরের জন্য সুদান সরকারের আর্থিক সমস্যাদি সমাধানের নিমিত্তে খার্তুমেও প্রেরণ করা হয়।

স্টেট ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি জামাতের কাজের জন্য রাবওয়ায় অবস্থান করাকে প্রাধান্য দেন। অর্থনীতি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি সামনে এলে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হত। এসংক্রান্ত একটি কমিটি ছিল, আমিও তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতাম। এবিষয়ে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন ভাল প্রবন্ধাদি লিখতেন। তাঁর প্রতিটি গবেষণা ছিল গভীর, তিনি এর বাস্তব বা ব্যবহারিক সমাধান উপস্থাপন করতেন। তার (প্রণীত) কয়েকটি গ্রন্থও রয়েছে যার মধ্যে ইংরেজিতে রয়েছে, "ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি" "ইসলামী ফলসফায়ে হায়াত ও মুয়াশী উসূল" এটিও ইংরেজী ভাষায় আর উর্দূ বইগুলো হলো, "হুরমত সূদ" এবং "হসূ ল রিযক"। ১৯৮৯ সনে অবসর গ্রহণের

(শেষাংশ শেষের পাতায়..)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

নিজেদের মাঝে একটি বাধা রাখতে বলা হয়। বাধা তৈরীর বাহ্যিক সংকেত হল পর্দা।

আরও এক ছাত্রী বলে,' হুযুর! দীর্ঘ সময় আপনি হামবার্গে আসেন নি।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, সেখানে কি ১০০ শতাংশ মহিলাই পর্দা করতে শুরু করেছে? সুযোগ হলে অবশ্যই আসব। অনেকে পর্দার বিষয়ে চরম সীমা পর্যন্ত চলে যান। আমি পূর্বেও উদাহরণ দিয়েছিলাম যে, একটি গাড়ির চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে চালিকা বোরকা পরিহিতা ছিল আর লেখা ছিল তালিবানরা মহিলাদেরকে গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম। মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।

এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ বলতে যদি আমেরিকা এবং রাশিয়াকে বোঝানো হয়, তবে তাদের মধ্যকার বিদ্বেষের কারণ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তারা যদি ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তবে তারাই সেই জাতি। যে শক্তিই ইসলামকে ধ্বংস করতে চাই, তারাই ইয়াজুজ ও মাজুজ।

এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, আমার প্রফেসর বলেন, হাদীসে বলা হয়েছে, ৭২টি দল ভুল পথে থাকবে আর একটি সঠিক পথে। এই হাদীসটি দুর্বল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হাদীসটি যদি 'সিয়াহ সিত্তা' তে নাও থাকে, আর তা পূর্ণ হয়,তবে সেটি দুর্বল নয়। সুন্নীদের ৩৪-৩৫টি ফির্কা, সমসংখ্যক ফির্কা শিয়াদেরও আছে। যদিও এরও বিভিন্ন উপদলও তৈরী হয়েছে, যেগুলি তারা অনুসরণ করে। কয়দিন আগে আমাকে একটি কৌতুকে দেখানো হয়। যাতে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত। ঠিক সেই সময় অন্য একজন তাকে রক্ষা করে। রক্ষাকর্তা তাকে জিজ্ঞেস করে যে সে কোন্ ফির্কার। সে উত্তর দিলে আবারও প্রশ্ন করে যে সেই ফির্কার কোন্ শাখার সঙ্গে যুক্ত? জানা যায় যে তারা উভয়ে একই দল ও একই শাখার সঙ্গে যুক্ত। এরপর সে আবার প্রশ্ন করে যে, সে অমুক মসজিদে যায় নাকি অন্য মসজিদে? সে অন্য মসজিদে যায় শুনে রক্ষাকর্তা তাকে ধাক্কা মেরে নদীতে ফেলে দেয় আর বলে তুই কাফির। ফির্কার সংখ্যা তারাই গণনা করে দেখে যারা মানে না। আমরা তো মানি যে এগুলি এক একটি ফির্কা। লোকে বলে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু যখন সেটি পূর্ণ হল, তবে তা আর দুর্বল থাকল না। কোনও একটি জামাতের নাম বলুন যারা সারা পৃথিবীতে এক নেতার অধীনে নিজেদেরকে জামাত হিসেবে পরিচয় দেয়। জামাতুদ দাওয়াত এমনটি দাবি করে ঠিকই, কিন্তু তা একটি দেশেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অপর দিকে জামাত আহমদীয়ার দিকে লক্ষ্য কর, আফ্রিকা, ইউরোপ, সুদূর প্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আমেরিকা- যেখানেই যাও না কেন, একটিই জামাত রয়েছে। অন্যরা এই সত্য মানুক বা না মানুক, তোমাদের কাজ তবলীগ করা, ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া। হেদায়াত দেওয়া আল্লাহ্‌র কাজ।

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, কোনও হাদীস সঠিক কিনা তা জামাত কিভাবে পরীক্ষা করে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পথনির্দেশনার জন্য তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যেগুলি হল যথাক্রমে কুরআন, সুন্নত ও হাদীস। যে সমস্ত হাদীস কুরআন ও সুন্নতের পরিপন্থী সেগুলি ভুল। হাদীসগুলি পরবর্তীকালে সংগৃহীত হয়েছে। যে সমস্ত হাদীস কুরআন করীমের বিরুদ্ধে যায় না সেগুলি সঠিক। ছয়টি হাদীসের গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য, যেগুলিকে সিয়াহ্ সিত্তা বলা হয়।

আরও এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, ইসলাম পুরুষকে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। অনেক পুরুষ লুকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে। অনেক বছর পর যখন তার দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে জানাজানি হয়, তখন কি সেই বিয়েকেও সুন্নতসম্মত বলা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই আদেশ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়েছিল কিম্বা এমন কোন পরিস্থিতিতে যখন মহিলাদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পুরুষদের দুই-তিনটি চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন, যার জন্য বিয়ে বৈধ হয়। কিন্তু সঙ্গে এও বলেছেন যে, তোমরা ন্যায় বিচার কর এবং সমাজে এর ঘোষণা কর। কেউ যদি লুকিয়ে বিয়ে করে তবে সেই কাজ অন্যায়। কিন্তু এই বিয়েতে যদি কোন পুরুষ অপরাধী হয় তবে মহিলাও সমান দোষী। মহিলা যদি জানতে পারে যে, সে বিবাহিত। আর একথা জানা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বিয়ে করে তবে সেও একই দোষে দুষ্ট। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, একটি সম্পর্কের পর পুনরায় প্রস্তাব পাঠাবে না। মহিলাদের উপর অত্যাচার করো না। আর কারো স্বামীকে প্রলুব্ধ করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অত্যাচার। সন্তান লাভ কিম্বা ধর্মীয় প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। কিন্তু প্রথমে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপন করল, এর বিয়ে করল- এটা তো অন্যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কঠোরভাবে এটিকে নিষেধ করেছেন। ইসলাম এমনটি করতে বাধা দেয়। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে এর অনুমতি দিয়েছেন, সেখানে এও বলেছেন যে, প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে ন্যায় বিচার করবে আর ন্যায় বিচারের দাবি হল সমান ব্যবহার করা, তাদের সমান অধিকার দেওয়া। প্রথম স্ত্রীর তিন সন্তান আছে তাই দ্বিতীয় বিয়ে করল আর প্রথম স্ত্রীর কোনও খোঁজখবর নেওয়া হল না।

সেই ছাত্রী পুনরায় প্রশ্ন করে যে, এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর সম্মতি কতটা দরকার?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ন্যায় বিচার কর, সমান ব্যবহার কর। প্রথম স্ত্রীকে জানানো আবশ্যক। তার কাছে অনুমতি নেওয়ার কথা লেখা নেই।

৩১ই মে, ২০১৫

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ওয়াকফে নওদের ক্লাস

কুরআন করীমের তিলাওয়াত, নযম এবং হাদীসের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হয়, যা নিম্নে দেওয়া হল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন, 'আমি মনে করি সেই সব মৌলবীরা ভ্রান্তিতে নিপতিত, যারা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিরুদ্ধে। বস্তুত তারা নিজেদের ভ্রান্তি এবং দুর্বলতা গোপন করতে এমনটি করে থাকে। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান ও বিভ্রান্ত করে তোলে। এমনকি তারা এই পর্যন্ত ধরে নিয়েছে যেন যুক্তি ও বিজ্ঞান এবং ইসলাম পরস্পরের সঙ্গে বিসদৃশপূর্ণ। কেননা তারা নিজেরা দর্শনশাস্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশ করতে অপারগ। এজন্য তারা নিজেদের এই দুর্বলতা লুকানোর জন্য এই মতবাদ তৈরী করেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের অধ্যয়ন করাই বৈধ নয়।"

"অতএব বর্তমানে ধর্মের সেবা এবং আল্লাহ্‌র বাণীর মহত্ব প্রকাশের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করা এবং সাধনা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার এও অভিজ্ঞতা আছে যা আমি এখানে সতর্কবাণী হিসেবে বর্ণনা করে দিতে চাই। যারা কেবল জাগতিক জ্ঞানের গবেষণাতেই মগ্ন হয়ে পড়ল, এতটাই যে, তারা আধ্যাত্মিক পুরুষ ও পুণ্যাত্মাদের সহচার্যে বসার সুযোগই পায় না। এমনকি যাদের অন্তরও আধ্যাত্মিক জ্যোতি শূন্য, তারা সাধারণত হোঁচট খায় এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। আর ইসলামের আলোকে এই বিজ্ঞানকে দেখার পরিবর্তে উল্টো ইসলামকেই বিজ্ঞানের চিন্তাধারা অনুসারে পরিচালিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আর এর দ্বারা তারা নিজেরাই নিজেদেরকে দেশ ও জাতির সেবক ও তত্ত্বধায়ক মনে করে বসে। কিন্তু স্মরণ রেখো, এই কাজ কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যার মধ্যে

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২০ বাতিল করা হয়েছে

জামাতের সমস্ত পদাধিকারী এবং সদস্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ২০২০ সালে কাদিয়ানে সালানা জলসা যা ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল, দেশে বর্তমান কোরোনা পরিস্থিতি, যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যান্য বিধিনিষেধকে দৃষ্টিপটে রেখে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

এরপর সাবিহ আহমদ সাদিক সাহেব ‘কুরআনের বিজ্ঞান’ বিষয়ের উপর একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করে।

কুরআন করীমের ওহী সূচনা হয় যে আয়াতের মাধ্যমে আপনারা তার অনুবাদ এখনই শুনেছেন। এটিই ছিল সর্বপ্রথম ওহী যা আমাদের নবী হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এইরূপে কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তা’লা এই ঘোষণা করলেন যে, এখন পৃথিবীতে কলমের মাধ্যমেও এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হবে। আর এমনটিই হয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: ‘আল্লামা বিল কালাম’ এর একটি অর্থ এটিও যে, কুরআন করীমের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সমস্ত বিজ্ঞান পৃথিবীতে বিস্তৃত হবে। তাই আমরা দেখি যে, আজ পৃথিবীতে যত প্রকারের বিজ্ঞান আছে, সেগুলি সবই কুরআন করীমের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। কুরআন করীম আরব জাতিতে নাযেল হয়েছিল আর আরব জাতি ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা জানতই না যে ইতিহাস কাকে বলে কিম্বা ব্যাকরণ কি জিনিস , ধর্মতত্ত্ব কি আর এর কিই বা এর নীতি। কিন্তু যখন কুরআন করীমের উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য হল, তখন কুরআন করীমের কারণে তারা সেই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হল।.... এইভাবেই ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান নথিভুক্ত রাখার পদ্ধতির উৎপত্তি হল।.... অনুরূপভাবে কুরআন করীমের সেবার জন্য অভিধান পুস্তকও রচিত হল। ...মোট কথা, পৃথিবীতে একের পর এক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব হল, তা কেবল কুরআন করীমের মাধ্যমেই। আর এর সমর্থনের জন্য আল্লাহ্ তা’লা তা প্রকাশ করেছেন। এই জ্ঞানের সূচনা যদি না হত, তবে কুরআন করীমের বাস্তবতা এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ অবহিত হতে পারত না। একই জিনিস অর্থনীতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটিকে কুরআনের অর্থনীতি বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ... মোটকথা ব্যাকরণ, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব- সব কিছুই কুরআন করীমের সেবার জন্য অস্তিত্ব লাভ করেছে। নচেত আরব জাতি ছিল অজ্ঞ। সেই সব জ্ঞানের প্রতি তাদের মনোযোগ কেনই বা আকৃষ্ট হত? তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ,তারা কুরআনকে মানল এবং পৃথিবীকে কুরআন সম্পর্কে অবগত করার জন্য তাদেরকে সেই বিজ্ঞানের উদ্ভাবন কিম্বা এর প্রসারের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হল। আর অবশিষ্ট বিশ্বও কুরআন করীম থেকেই সমস্ত বিজ্ঞান শিখেছে, কেননা এই বিজ্ঞান আরবরাই উদ্ভাবন করেছে বা জীবিত করেছে এবং পরে সারা বিশ্ব তা গ্রহণ করেছে।

ইউরোপের কাছে এমন কোনও জিনিসও ছিল না। তারা যা কিছু শিখেছে, তা সবই স্পেনের মুসলমানদের কাছে শিখেছে। আর স্পেন যা কিছু শিখেছে তা সিরিয়ার কাছে আর সিরিয়াবাসী শিখেছে কুরআন থেকে। অতএব জগতের যাবতীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি কুরআন থেকেই হয়েছে। এখন কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু লেখালেখি হবে, কুরআন করীমের সেবা এবং এতে বর্ণিত বিজ্ঞানের প্রচলনের জন্যই হবে। আজ ইউরোপে যত সব বইপুস্তক ছাপানো হচ্ছে, সেগুলি সবই ‘আল্লামা বিল কালাম’-এর সত্যায়ন করছে আর আল্লাহ্ তা’লার সেই ভবিষ্যদ্বানীকে সত্য প্রমাণিত করছে যে, কলমের মাধ্যমে কুরআন করীম প্রসার লাভ করবে। আরব জাতি যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত ছিল। কিন্তু কুরআন করীমের উপর ঈমান আনার পর তারা বিশ্বগুরু হয়ে ওঠে এবং যে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ইউরোপ আজ এত গর্বিত, সেটাও তাদেরই আবিষ্কৃত।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে থাকে না, এক প্রজন্মের পর দ্বিতীয় প্রজন্ম সেই বিজ্ঞানকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় তৎপর থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বীজের মূল্যই ভিন্ন, যা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। বৃক্ষই যতই বড় হোক, বীজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক, এর মুকুট মুসলমান জাতির মস্তকেই শোভা পাবে। আর মুসলমানদের মাথা কুরআন করীমের সামনে অবনত থাকবে।কেননা এই সেই গ্রন্থ যা ঘোষণা করেছে, ‘আল্লামা বিল কালাম’। এখন পৃথিবীকে কলমের মাধ্যমে বিজ্ঞান শেখানোর সময় এসেছে। অতএব সত্য এটাই যে, পৃথিবীকে কুরআনই যাবতীয় বিজ্ঞান শিখিয়েছে। যদি না কুরআন আসত,তবে পৃথিবী এক অন্ধকার পিণ্ড হয়ে থাকত, চতুর্দিকে অজ্ঞতা ও বর্বরতার দৃশ্য পরিলক্ষিত হত। এটি কুরআনেরই অনুগ্রহ যে তা পৃথিবীকে অন্ধকার থেকে টেনে বের করে জ্ঞানের জগতে এনে দাঁড় করিয়েছে।

(তফসীর কবীর, ৯ম খণ্ড,পৃ: ২৭১)

এরপর আদনান কলীম ‘কুরআনের বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত’ বিষয়ক নিজের প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রিয় ভাইয়েরা! কুরআন করীমের মধ্যে অসংখ্য বিজ্ঞান বিদ্যমান, যে বিষয়ে কুরআন বার বার আমাদেরকে মনোযোগ দেওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন সূরা রউম-এর ২২-২৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘নিশ্চয় এতে এমন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে যারা চিন্তাভাবনা করে।’ এরপর বলেন, ‘নিশ্চয় এতে এমন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে, যারা কথা শোনে।’ এরপর বলা হয়েছে, ‘বুদ্ধিমান জাতির জন্য এতে বহু নিদর্শন আছে।’

সময়ের প্রেক্ষিতে আপনাদের সামনে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করব, যেগুলি সম্পর্কে কুরআন আমাদেরকে চিন্তাভাবনা করার নির্দেশ দেয়।

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে কুরআন করীম ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি (যাকে বিগ ব্যাং থিয়োরি বলা হয়), প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসার, গ্যালাক্সি, নক্ষত্ররাজি, গ্রহপুঞ্জ, ধুমকেতু, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সম্পর্কে সেই সব তথ্য বর্ণনা করেছে যা আধুনিক গবেষণার আলোকে এই যুগে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আর কেউ বলতে পারবে না যে আরও কত এমনই সব তথ্য এখনও পর্যন্ত আমরা বুঝে উঠতে পারি নি। খোদা তা’লা সূরা তাকবীরের ১২ নং আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে মহাকাশবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন হবে। যেমন বলা হয়েছে, ‘আকাশের আবরণ বিদীর্ণ করা হবে।’ মহাকাশবিদ্যা সম্পর্কে কুরআন করীমে শত শত আয়াত বিদ্যমান, যেগুলি আমাদেরকে আরও গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করে। আকাশের মত ভূ-পৃষ্ঠ সম্পর্কেও অনেক আয়াত রয়েছে। পৃথিবীর সৃষ্টি, পবর্তমালার উৎপত্তি, পানি ও মেঘের কালচক্র, গাছপালার বেড়ে ওঠা, প্রাণীজগতের সৃষ্টি, মোটকথা পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাইড্রোলোজি, জুলোজি, ওসিয়ানোলোজি, বোটানি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন করীম বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অনুরূপভাবে খোদা তা’লা কুরআন করীমে সূরা ইনফিতার-এর ৫ নং আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ যুগে আর্কিওলোজিও গবেষণাতেও অনেক উন্নতি হবে। যেমন বলা হয়েছে, ‘এবং যখন কবর খনন করে এদিক ওদিক উৎপাটিত করা হবে।’ এছাড়াও পুরাতত্ত্ব বিদ্যা সম্পর্কেও অনেক আয়াত বিদ্যমান, যা আমাদেরকে ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণায় দিক-নির্দেশনা দেয়।

কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত এবং জন্মের পর্যায়ক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। এবং বিশেষ করে এমব্রোলোজি সম্পর্কে এমন তথ্য দেওয়া হয়েছে যে, এবিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ, যারা খোদায় বিশ্বাসী নন, তারাও কুরআন করীমের এই তথ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে কিভাবে এই জ্ঞান লাভ হয়েছিল! এই আয়াতগুলি নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে আমাদেরকে আরও গবেষণা করতে সাহায্য করবে।

আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে পারলাম। অথচ কুরআন করীমের যাবতীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞানের আধারও বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এই নিদর্শনগুলির উপর চিন্তাভাবনা করার তৌফিক দান করুন।

এরপর হাসান আহমদ ‘কুরআন এবং বিজ্ঞান’ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, ‘কুরআন মানুষকে বিজ্ঞান থেকে বিরত রাখে না। বরং বলা হয়েছে, ‘আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাভাবনা কর।’ (সূরা ইউনুস:১০২) আকাশ বলতে খগোলীয় বস্তুসমূহের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। যদি খোদার নিকট এই বিষয়ে জ্ঞান চর্চার পরিণাম ধর্ম বিমুখতা হত, তবে কুরআন এই জ্ঞান লাভ করতে বাধা দিত। কিন্তু এর বিপরীতে কুরআন শিক্ষা দেয়,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 17 Dec, 2020 Issue No.51

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবা শেষাংশ...)

পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র তাহরীকে ওয়াক্ফ করে তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ানোর উদ্দেশ্যে উযবেকিস্তান গমন করেন, সেখানে ছয়মাস কাজ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) 'বন্ধক ও সুদ' সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রতি প্রণিধাণ করার জন্য উলামা ও অভীজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন তিনি এর সদস্য ছিলেন আর এর একটি সাব-কমিটিও ছিল,এতে আমিও কিছুদিন তার সাথে কাজ করেছি। যেমনটি আমি বলেছি, প্র তিটি বিষয়ের গভীরে অবগাহন করে সব কথা বলতেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতেন। সুদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাকেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন, সেগুলো খুবই ভালো প্রবন্ধ। এগুলোর প্রতি আরো প্রণিধান করা হবে। ভবিষ্যতে সুদভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে যে ব্যবস্থাপনা সামনে হবে তাতে তার বিভিন্ন মতামতও যুক্ত করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকাজগুলোর ওপর চলার তৌফিক দান করুন।

(১ম পাতার শেষাংশ...)

جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

সশস্ত্র জিহাদ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ এবং অন্যান্য আরও জিহাদগুলি লঘুতর। কেবল কুরআন করীমের জিহাদই হল সব থেকে বড় জিহাদ। এটি সেই অস্ত্র, যার উপর যদি কোন ব্যক্তি পড়ে তার মুণ্ডুপাত হবে আর যে ব্যক্তি এর উপর পড়বে সেও মারা যাবে বা ইসলামের দাসত্ব স্বীকার করে অমর হয়ে যাবে। তেরোশ বছরেও সমগ্র বিশ্বে ইসলাম যে প্রসার লাভ করে নি, তার কারণ এটি নয় যে এই অস্ত্র ভোঁতা ছিল। বরং এর প্রধান কারণ ছিল, মুসলমানেরা এই অস্ত্রকে কাজে লাগানো ছেড়ে দিয়েছে। আজ খোদা তা'লা আহমদীদেরকে পুনরায় সেই অস্ত্র হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন এবং স্বীয় ধর্মকে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার সংকল্প করেছেন। কিন্তু কিছু নির্বোধ আছে, যারা আহমদীয়াতের উপর আক্রমণ করে বলে, আহমদীরা জিহাদে বিশ্বাসী নয়। তাদের উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে গুলতি নিয়ে যদি দুর্গের উপর আক্রমণ করে, তা দেখে আরও কিছু মানুষ মনে করে যে গুলতি দিয়ে কিভাবে দুর্গ জয় হয়! তাই তারা কামান নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু গুলতি ধারী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে উল্টো আপত্তি করতে শুরু করে বলে, তারা কেন তার মত গুলতি ছুড়ছে না। এই নির্বোধরাও নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে সেই ব্যক্তিকে জিহাদের অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করে, যে ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫১২)

(১১ পাতার পর...)

অবশ্যই গবেষণা কর, জ্ঞান চর্চা কর এবং ভালভাবে যাচাই কর। কেননা , তিনিই জানেন যে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে যতটা উন্নতি হবে, তাঁর সত্যায়ন হবে। কুরআন করীমের এই আয়াতও বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ আকর্ষন করে। 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে অভিনিবেশ করলে জানা যায় যে পৃথিবীতে কোনও জিনিস বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি।

(আলে ইমরান:১৯১-১৯২)

লক্ষ্য কর, এই আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কে কিরূপ প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বস্তুসমূহের উপযোগিতা বর্ণনা করে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে কোনও জিনিস বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি। এ জিনিস গবেষণা না করে কিভাবে জানা যেত। কুরআন করীম বস্তুসমূহের বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং এর পাশাপাশি এই সোনালী নীতি শিখিয়েছে যে, কোনও বস্তুকে বৃথা বলে মনে করো না, কারণ তিনি কোনও কিছুই বৃথা বা অকারণ সৃষ্টি করেন নি। অর্থাৎ দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার এবং দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। (ক্রমশ....)

ইতালির ত্রয়োদশতম বাৎসরিক জলসা (২০১৯) উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর বিশেষ বার্তা

জামাত আহমদীয়া ইতালি-র প্রিয় সদস্যবর্গ

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহি, জামাত আহমদীয়া ইতালি তাদের জলসার আয়োজন করার তৌফিক লাভ রছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই জলাসাকে সার্বিক সফলতা দান করুন এবং এর আধ্যাত্মিক আশিসরাজি থেকে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। মনে রাখবেন যে এটি এক ধর্মীয় সমাবেশ, কাজেই এই সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদেরকে যিকরে ইলাহি, খোদার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কিছুদিন পূর্বেই আপনারা রমযান মাসে রোযা রাখার এবং ইবাদত করার তৌফিক পেয়েছেন। আপনাদের প্রতি আমার বার্তা হল রমযান মাসের এই সব ইবাদত এবং পুণ্যময় পরিবর্তনকে ভবিষ্যত জীবনের স্থায়ী অংশ করে নিন। নিজেদের উন্নত দৃষ্টান্ত মেলে ধরুন। কেবল নামসর্বস্ব আহমদী হওয়া যথেষ্ট নয়। নিজেদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করুন, আর তাকওয়া নামে নয় বরং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে কারণে প্রতি প্রত্যাদিষ্ট করেছেন সেটি এই যে তাকওয়ার স্থান শূন্য পড়ে রয়েছে। তাকওয়া থাকা আবশ্যক। .... যদি তোমরা তাকওয়াশীল হও, তবে সারা পৃথিবী তোমাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা সুরা পান করে বা যাদের ধর্মে বৈশিষ্টের মধ্যে সুরা অন্যতম, তাদের সঙ্গে তাকওয়ার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। তারা পুণ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের জামাতকে পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাকওয়া ও পবিত্রতায় উন্নতির করার সৌভাগ্য দান করে, তবে সেটিই বড় সফলতা হিসেবে পরিগণিত হবে, এর থেকে অধিক কার্যকরী আর কিছু হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৫, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল:২০০৩)

এর পর রয়েছে নামায, যে বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। আমি এর প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। খোদা তা'লার সঠিক অর্থে ইবাদত তখনই হবে যখন আমরা নামায প্রতিষ্ঠাকারী হব। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের নিজের নামাযের সুরক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" যে ব্যক্তির অভ্যন্তরভাগ পাপে পরিপূর্ণ, খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁর নৈকট্য থেকে যে দূরে পড়ে রয়েছে, নামায হল তাকে পবিত্র করার এবং খোদার নৈকট্য প্রদানের মাধ্যম। এর মাধ্যমে সেই সকল পাপ দূরীভূত হয় এবং পরিবর্তে পবিত্র মনন সৃষ্টি হয়। নামায হল সেই বস্তু, যে মন্দকে প্রতিহত করে' -এটিই এই ভাষ্যের মর্মার্থ।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৩, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

অতএব আপনারা নিজেরাও নামাযের সুরক্ষা করুন আর সন্তান-সন্ততিকেও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজে নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হবেন, নিজের ব্যবহারিক নমুনা তুলে ধরবেন, ততক্ষণ আপনার সন্তান-সন্ততিও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। আপনি যদি নিজে নামায কায়েমকারী হন আর সন্তান-সন্ততিকেও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তবে তরবীয়ত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান নিজেই হয়ে যাবে।

আত্ম-সংশোধন যথারীতি একটি জিহাদ বা সংগ্রাম যা নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া উচিত। সব সময় আত্ম-সমীক্ষা করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন করার তৌফিক দান করুন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন আর আপনারা যেন সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী হোন। আমীন

ওয়াসসালাম

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir